আমাদের পূর্বপুরুষদের আনন্দিত করা

দাজি

১৫৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বার্তা

পূজ্য শ্রী লালাজী মহারাজের

২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ - কানহা শান্তি বনম

আমাদের পূর্বপুরুষদের আনন্দিত করা

প্রিয়জনেরা,

প্রতিবছর বসন্ত পঞ্চমী এলে, আমার হৃদয়ে এমন কিছু ঘটে যা সম্পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হলুদ ফুল, বাতাসে ফিরে আসা কোমল উষ্ণতা, আর বসন্তের কুঁড়ি - সবই যেন নবজাগরণের কথা বলে। কিন্তু আমাদের মতো যারা এই পথের পথিক, তাদের কাছে এই দিনটি ঋতুর সীমা ছাড়িয়ে এক বিশেষ সুবাস বহন করে, কারণ এই দিনেই দিব্য জ্যোতি পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

১৮৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এমন এক বিশেষ মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, যিনি চিরকালের জন্য মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পথ পরিবর্তন করে দেন। সেই সময় বিশ্ব তা জানত না। জানবেই বা কীভাবে? মহাত্মারা নীরবে আসেন, কোনো আড়ম্বর ছাড়াই, সাধারণতার আড়ালে নিজেকে আচ্ছাদিত করে। কিন্তু প্রকৃতি জানত, এবং সেদিন প্রকৃতি নীরবে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সেই শিশুর মা ছিলেন এক সাধ্বী নারী, যার হৃদয় ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ। একদিন, এক অবধূত ভিক্ষা চাইতে তাঁর দরজায় এলেন। তিনি আহারের জন্য

মাছ চাইলেন, কিন্তু সেই মহিলা কখনও মাছ - মাংস রান্না করতেন না, খেতেনও না। কৃপাবশত, গৃহের সচেতন দাসী পাশের বাড়িতে গিয়ে দুইটি মাছ নিয়ে এল, এবং সাধু সেই আহার গ্রহণ শেষ করলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কষ্ট কী?" মহিলা নীরব রইলেন, কিন্তু দাসী বলল, "আমার মহীয়সী গৃহিণীর সবই আছে, শুধু একটি সন্তান নেই।"

"ওহ!" - উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বললেন সাধু, গভীর নীল আকাশের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কয়েক মুহূর্ত পর তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি স্বর্গের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "এক... দুই... এক... দুই..." - এবং প্রস্থান করলেন, আর কখনও তাঁকে দেখা গেল না।

পরের বছর, ১৮৭৩ সালের বসন্ত পঞ্চমীতেই প্রথম পুত্রের জন্ম হলো, এবং তিনি ছিলেন ফতেহগড়ের রামচন্দ্র, যিনি লালাজী নামেও পরিচিত।

এই বিশেষ মহাপুরুষ সম্পর্কে এমন কী বলা যায়, যা আগে বলা হয়নি? কবিরা চেষ্টা করেছেন, শাস্ত্র ইঙ্গিত দিয়েছে, আর টেনিসন লিখেছিলেন এমন কিছু পংক্তি, যা যেন কেবল তাঁর জন্যই লেখা -

"তুমি মানব ও দিব্যের মিলন,
মানবত্বের সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা পবিত্র রূপ।"

মাত্র সাত মাসের মধ্যে, তরুণ বয়সেই, তিনি এমন সিদ্ধি অর্জন করেন, যা অসংখ্য জন্মেও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। দিব্য জ্যোতি তাঁর কাছে কোনো দূরবর্তী লক্ষ্য ছিল না; তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বাস করত। তিনি তাকে খুঁজেননি; তিনি নিজেই তা ছিলেন।

লালাজীর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য এক বিস্মৃত উত্তরাধিকার পুনর্জীবিত হয়েছিল: পবিত্র প্রাণাহুতি বিজ্ঞান, যা "প্রাণস্য প্রাণা" বা জীবনের পরম সত্তার সঞ্চার নামেও পরিচিত। এই গভীর জ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অযোধ্যার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রজীর তিয়াত্তর প্রজন্ম পূর্বে, পূজ্য শ্রী ঋষভ দেবজী মহারাজের মাধ্যমে, যিনি জীবনের মূল সত্তা স্থানান্তরের এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান উদঘাটন করেছিলেন।

দিব্য শক্তির সঞ্চারের মাধ্যমে চেতনার উচ্চতর স্তরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা নয়, বরং সুষম সমন্বয়ের পথেই সাধকের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবেশ ঘটে, যেখানে জগতে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেও অন্তরে পরম সত্তার সঙ্গে ঐক্য বজায় থাকে এবং গৃহস্থ হিসেবে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করা হয়। দিব্য শক্তির সঞ্চারের এই জীবন্ত ধারা আন্তরিক ও নিয়মিত সাধনার মাধ্যমে অনেক সময় আশ্চর্যজনকভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই সাধককে সমাধির অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

তবু মানব ইতিহাসের প্রবাহে এই অমূল্য বিজ্ঞান ধীরে ধীরে মানবচেতনা থেকে লুপ্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়। তা নিয়তির হস্তক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় ছিল; এরপর লালাজী মহারাজ সেই পবিত্র ধারাকে পুনরাবিষ্কার ও পুনরুজ্জীবিত করেন, মানবজাতির জন্য সর্বোচ্চের দিকে এক প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত পথ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এটাই ছিল লালাজীর উপহার : শুধু দর্শন বা উপদেশ নয়, বরং হৃদয় থেকে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রত্যক্ষ সঞ্চার।

দিব্য শক্তির সঞ্চারের মাধ্যমে চেতনার উচ্চতর স্তরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা নয়, বরং সুষম সমন্বয়ের পথেই সাধকের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবেশ ঘটে, যেখানে জগতে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেও অন্তরে পরম সত্তার সঙ্গে ঐক্য বজায় থাকে এবং গৃহস্থ হিসেবে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করা হয়।

এরপর এলেন শিষ্য।

শাহজাহানপুরে রামচন্দ্র নামে এক যুবক (বাবুজী) ফতেহগড়ের সেই সাধুর কথা শুনলেন। লালাজীর নাম শুনেই তাঁর অন্তরে এক অদৃশ্য আন্দোলন জাগল; সেই টানেই তিনি তাঁর দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। ১৯২২ সালের ৩ জুন প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর জীবন চিরতরে বদলে গেল।

তিনি লিখেছিলেন, "প্রথমবার আমার গুরুর কাছে এসে আমি এমন এক মানসিক অবস্থার অভিজ্ঞতা পাই, যার তুলনা নেই। সেই মুহূর্তের আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। সেদিন থেকেই আমি নতুন জীবন যাপন শুরু করি। সবকিছু বদলে গেল। পৃথিবীকে অন্যরকম মনে হলো।"

এইভাবেই শুরু হলো এক প্রেমকাহিনি, যা আধ্যাত্মিক ইতিহাসের সকল সীমা অতিক্রম করে যাবে। আমি এই কথাগুলি হালকাভাবে বলছি না, কারণ লালাজী ও তাঁর শিষ্যের মধ্যে যা উদ্ভাসিত হয়েছিল তা কোনো সাধারণ ভক্তি ছিল না। তা ছিল শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর প্রচলিত শ্রদ্ধারও বহু ঊর্ধ্বে। এমন এক সম্পর্ক যার প্রকাশে ভাষা অক্ষম, যার বিস্ময়ে স্বর্গীয় সত্তারাও এক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল।

তাদের পারস্পরিক বন্ধন সম্পর্কে বাবুজী একবার বলেছিলেন: "আমরা পরস্পরের মধ্যে এক গভীর আত্মিক প্রবাহে যুক্ত ছিলাম, আধ্যাত্মিকভাবে

আমি এই কথাগুলি হালকাভাবে বলছি না, কারণ লালাজী ও তাঁর শিষ্যের মধ্যে যা উদ্ভাসিত হয়েছিল তা কোনো সাধারণ ভক্তি ছিল না। তা ছিল শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর প্রচলিত শ্রদ্ধারও বহু ঊর্ধ্বে। এমন এক সম্পর্ক যার প্রকাশে ভাষা অক্ষম, যার বিস্ময়ে স্বর্গীয় সত্তারাও এক মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল।

সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ, আমাদের হৃদয় ছিল এক ও অভিন্ন। প্রিয়জনের জন্য কোনো কিছুই অত্যধিক নয়; এমন প্রেম মানুষকে নিজের সীমা অতিক্রম করতে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে।"

অন্যত্র তিনি স্বীকার করেছিলেন যে লালাজী ছাড়া তিনি এক মুহূর্তের জন্যও অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। এখানে তিনি সেই শারীরিক লালাজীর কথা বলছিলেন না, যিনি বহু দশক আগে দেহত্যাগ করেছিলেন; বরং সেই কথাই বলছিলেন, যিনি তাঁর শ্বাসের অন্তঃশ্বাস, তাঁর প্রাণের প্রাণ, তাঁর জীবনের জীবন হয়ে উঠেছিলেন।

আমি এখন এমন একটি কথা ভাগ করে নিতে চাই, যা প্রতিবার পড়লে আমার চোখে অশ্রু এনে দেয়।

লালাজীর দিকনির্দেশমূলক বাণীতে বাবুজী সম্পর্কে এমন একটি উক্তি আছে, যা আমাদের বিস্ময়ে নীরব করে দেয়। লালাজী লক্ষ্য করেছিলেন যে বাবুজী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে জীবনের সর্বাধিক পবিত্র মুহূর্তগুলিতেও হৃদয়ে তাঁর গুরুকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেননি। তাঁর সংসার জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতেই এই আত্মিক সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল।

এটাই ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ : সংসারজীবনের অনুপস্থিতি নয়, বরং সেই জীবনের মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের উপস্থিতি। দেহ জগতে ক্রিয়াশীল থাকলেও বাবুজীর চেতনাবোধ সর্বদা উচ্চতর সত্তার দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

কোন ভালোবাসা এমন স্মরণকে ধারাবাহিকভাবে ধারণ করতে পারে? কোন ভক্তি এমন অবিচলতা বজায় রাখতে সক্ষম?

এখন আমি আপনাদের এমন এক অসাধারণ কথা বলব।

১৯৪৫ সালের ২১ মার্চ *Whispers from the Brighter World*-এ সংরক্ষিত এক আন্তঃসংলাপে এমন এক কথোপকথন রয়েছে, যা চিরস্মরণীয়, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। সেখানে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ লালাজীর বাবুজীর প্রতি প্রেমের কথা বলেন, আর তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করেন বাবুজীর লালাজীর প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসা।

মুক্তপ্রাপ্ত গুরু লালাজী তাঁর শিষ্য বাবুজীর কল্যাণার্থে নিজের ভাণ্ডার, স্বর্গীয় আবাস ত্যাগ করেছিলেন। শিষ্যের জন্য গুরু অবতরণ করেছিলেন; স্বর্গ যেন পৃথিবীর দিকে নত হয়ে এসেছিল।

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করলেন এমন কিছু বাক্য, যা আজও লিখতে গিয়ে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে, "স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি নিখাদ সত্য। প্রেমের বিষয়ে তুমি রাধাকেও অতিক্রম করেছ...রাধার প্রেম এখন তোমার প্রেমের পরেই স্থান পায়।"

আপনি কি উপলব্ধি করতে পারেন, এর তাৎপর্য কত গভীর? যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম ভক্তির চরম নিদর্শন হিসেবে বন্দিত হয়েছে। রাধার নামই যেখানে দিব্য প্রেমের প্রতীক, সেখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, লালাজীর প্রতি বাবুজীর প্রেম সেই প্রেমকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এই কাহিনির সমাপ্তি এখানেই নয়। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তা সমগ্র সৃষ্টির পরিমণ্ডলে এক অতুলনীয় পরিণতির শিখরে পৌঁছে যায়।

১৯৪৫ সালের ২৪ মার্চের সেই শুভদিনে লালাজী এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে বাবুজী স্বয়ং পরম সত্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ দীক্ষা লাভ করেন। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন, "আজ সত্যিই এক অত্যন্ত শুভ দিন, কারণ

আপনার পূজ্য গুরু আপনাকে স্বয়ং পরম সত্তার দ্বারা দীক্ষিত করিয়েছেন। এটাই প্রকৃত দীক্ষা নামে পরিচিত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এটাই তার প্রথম উদাহরণ।"

স্বামী বিবেকানন্দ যোগ করেন, "পরম সত্তার সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ দীক্ষার কথা শুনে আমি গভীর আনন্দে অভিভূত। জগতের সূচনালগ্ন থেকে এমন দৃষ্টান্ত এই প্রথম।"

এখন এক মুহূর্ত থেমে এমন একটি বিষয় ভাবুন, যার বিস্ময় আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

এই সর্বোচ্চ ঘটনার পর লালাজী নীরবে এমন একটি কথা বলেছিলেন, যা তাঁর নিঃস্বার্থতার গভীরতা প্রকাশ করে। তিনি বলেন, "প্রত্যক্ষ দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আমারই পদ্ধতি। পূর্বে এটি কারও বোধগম্যতায় আসেনি, এমনকি কখনও কার্যকরও করা হয়নি।"

গুরু শিষ্যকে নিজের আগে স্থান দিয়েছিলেন, যা তিনি নিজে কখনও গ্রহণ করেননি, তাই তিনি শিষ্যকে দান করেছিলেন। এমন প্রেম যুক্তির অতীত; তা হয়তো সন্তানের জন্য পিতামাতার আত্মত্যাগের চেয়েও, কিংবা প্রিয়জনের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া প্রেমের চেয়েও গভীর। এখানে গুরু আবিষ্কার করেছিলেন সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক দান, আর তা তিনি তাঁর শিষ্যকে প্রদান

এই সর্বোচ্চ ঘটনার পর লালাজী নীরবে এমন একটি কথা বলেছিলেন, যা তাঁর নিঃস্বার্থতার গভীরতা প্রকাশ করে। তিনি বলেন, "প্রত্যক্ষ দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আমারই পদ্ধতি। পূর্বে এটি কারও বোধগম্যতায় আসেনি, এমনকি কখনও কার্যকরও করা হয়নি।"

করেছিলেন, নিজে নেপথ্যে থাকতে সন্তুষ্ট, শিষ্যকে এমন উচ্চতায় আরোহন করতে দেখে পরিতৃপ্ত, যে উচ্চতা তিনি নিজে কখনও কামনা করেননি।

এই সর্বোচ্চ দান অর্পণ করার পর লালাজী নিজের সম্পর্কে কী বলেছিলেন? তিনি একটি ফারসি দ্বিপদী উদ্ধৃত করেছিলেন: "হাজারো দাসের অধিপতি রাজা মাহমুদ গজনভি এমন দারিদ্র্যে পতিত হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি এক দাসেরও দাসে পরিণত হন।" এরপর লালাজী অত্যন্ত সহজভাবে শুধু এটুকুই যোগ করেছিলেন, "এটাই আমার অবস্থা।"

গুরুদের গুরু, সেই বিশেষ মহাপুরুষ, যিনি হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করেছিলেন, যাঁর মাধ্যমে প্রাণাহুতি সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রবাহিত হয়, তিনি নিজেকে 'দাসের দাস' বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর শিষ্যকে এমন এক দান প্রদান করেছিলেন, যা তাঁর নিজের থেকেও মহান।

এখানে আমরা এমন এক গুরুর পরম প্রেমের সাক্ষী হই, যিনি নিজে সর্বোচ্চ ফল ভোগ না করে তা আগে তাঁর শিষ্যকে আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় এতই বিশাল ছিল যে, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য আবিষ্কার করার পর তিনি তা নিজের কাছে না রেখে অন্যের হাতে তুলে দেন। কিন্তু একে 'ত্যাগ' বলা হলে তা হবে একজন সত্য গুরুর হৃদয়কে ভুলভাবে বোঝা। এই দানই ছিল লালাজীর জন্য পরম আনন্দের উৎস।

আসলে, একজন গুরুর কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই নেই, নিজের শিষ্যকে নিজেকেও অতিক্রম করতে দেখা, প্রিয়জনকে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠতে দেখা, সর্বস্ব দান করে প্রতিদানে কেবল পরিপূর্ণতাই অনুভব করা। যেমন মা সন্তানের মুখে আহার তুলে দিলে তাকে ত্যাগ বলা যায় না, তেমনি নদী সাগরে মিশে গেলে তাকে আত্মবিসর্জন বলা হয় না। লালাজীর কাছে বাবুজীকে পরম

সত্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণকারী প্রথম মানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা ছিল একদিকে পরিপূর্ণতার অনুভব, অন্যদিকে পরম আনন্দের উৎস।

আসলে, একজন গুরুর কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই নেই, নিজের শিষ্যকে নিজেকেও অতিক্রম করতে দেখা, প্রিয়জনকে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠতে দেখা, সর্বস্ব দান করে প্রতিদানে কেবল পরিপূর্ণতাই অনুভব করা।

এটাই ভালোবাসা। এটাই সাধনার পথ। বসন্ত পঞ্চমীতে আমরা এই সত্যকেই উদ্‌যাপন করি।

বর্তমান যুগ সম্পর্কে লালাজী একবার বলেছিলেন, "এই সময়টি আর খুব দীর্ঘকাল ফিরে আসবে না। এই বিশেষ সময়ের ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ প্রযোজ্য : "মজনু বনকে নিজের ঘর বানিয়েছিল, আর আমি আমার ঘরকেই বন বানিয়েছি।" কিংবদন্তি প্রেমিক মজনু প্রেমে উন্মাদ হয়ে সভ্যতা ত্যাগ করে অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এর বিপরীতে, গুরু লালাজী তাঁর নিজের স্বর্গীয় আবাসকেই আকুলতার এক অরণ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন,তাঁর শিষ্যের জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাবুজীর যোগ্যতার মাত্রাকে 'অনুত্তর', সর্বোচ্চ শ্রেণি হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এমন যোগ্যতা কখনও কখনও বহু বছর, শতাব্দী, এমনকি সহস্রাব্দ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎই জন্ম নেয়, যার কোনো তুলনা নেই। এমন যোগ্য ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশেই জন্মগ্রহণ করে। তুমি তারই উদাহরণ।"

লালাজী ১৯৩১ সালে দেহত্যাগ করার পর বাবুজী লেখেন, "সত্য বলতে কী, আমার গুরু প্রয়াণ করেননি; আমি নিজেকেই মৃত বলে অনুভব করেছি।" এর

পরবর্তী বহু বছর তাঁর দিনলিপি প্রায় নীরবই রইল। যিনি গুরুর জীবদ্দশায় অবিরাম লিখে গেছেন, সেই শিষ্য তখন এক সুপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করেন, যেন সেই অন্ধকারের গর্ভেই নতুন কিছুর অঙ্কুরোদগমের অপেক্ষা চলছিল।"

এরপর ১৯৪৪ সালে তাঁদের মধ্যে সেই যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। যে সম্পর্ককে শারীরিক মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল, তা আসলে কেবল রূপান্তরিত হয়েছিল। লালাজী পথনির্দেশ দিতে থাকলেন, প্রাণাহুতি প্রবাহিত করতে থাকলেন, এবং ভালোবাসতে থাকলেন। সেই বন্ধন মৃত্যুকে অতিক্রম করল, সেই প্রেম দেহের সীমা ছাড়িয়ে গেল, আর সেই সঞ্চার আজও অব্যাহত রয়েছে।

আমি বসন্ত পঞ্চমীতে এসব কথা কেন ভাগ করে নিচ্ছি? যাতে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন, আপনাকে কোন মহান উত্তরাধিকারটির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আপনি যখন ধ্যানে বসে হৃদয়ের মধ্যে সেই কোমল সাড়া অনুভব করেন, তখন আপনি সেই একই ধারার স্পর্শ পাচ্ছেন, যা লালাজী ও বাবুজীর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। আপনি যখন প্রাণাহুতি গ্রহণ করেন, তখন আপনি মানবজাতির জন্য বহু প্রজন্ম ধরে হারিয়ে যাওয়া এবং পরে পুনরুদ্ধার করা সেই দানই গ্রহণ করছেন; আর যখন এমন এক অবর্ণনীয় আকুলতা অনুভব করেন, যার কোনো নাম দিতে পারেন না, তখন আপনি এমন এক প্রেমের প্রতিধ্বনি অনুভব করছেন, যা রাধার প্রেমকেও অতিক্রম করেছিল।

এটাই আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের জন্মগত অধিকার। বসন্ত পঞ্চমী ১৮৭৩-এ জন্ম নেওয়া এক শিশুর কারণে, যিনি পরবর্তীকালে গুরু হয়ে উঠেছিলেন এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অতুলনীয় এক প্রেমে এক শিষ্য সেই গুরুকে ভালোবেসেছিল বলেই এই দান আজ আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

বসন্তের ফুল ফুটে ওঠে, পৃথিবী নিজেকে নবীকৃত করে তোলে, আর যারা সাধনায় নিয়োজিত, তাদের হৃদয়েও নীরবে, দিনের পর দিন, একই নবজাগরণ ঘটে, কারণ প্রাণাহুতি তার কাজ অব্যাহত রাখে।

এই বসন্ত পঞ্চমীতে আমি সেই বিশেষ মহাপুরুষ পূজ্য শ্রী লালাজী মহারাজের চরণে নত হই, যাঁর দ্বারা এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে। আর আমি পূজ্য শ্রী বাবুজী মহারাজের চরণেও প্রণাম জানাই, যাঁর প্রেম এমন এক দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা কখনও বন্ধ হতে পারে না।

আমরাই এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কী অপূর্ব এক বংশপরম্পরা! কী অমূল্য এক ধন আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে! এখন প্রশ্নটি আমাদের দিকেই এসে দাঁড়ায়: এই উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা কী করব?

আসুন, আমাদের আধ্যাত্মিক পিতৃপুরুষদের আরও সুখী, আরও আনন্দিত করি। তাঁরা যেন দিব্যলোক থেকে নীচে তাকিয়ে পরমানন্দে নৃত্য করেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ দেখে, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে, এবং আমরা যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে দেখেই।

আসুন, আমাদের আধ্যাত্মিক পিতৃপুরুষদের আরও সুখী, আরও আনন্দিত করি। তাঁরা যেন দিব্যলোক থেকে নীচে তাকিয়ে পরমানন্দে নৃত্য করেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ দেখে, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে, এবং আমরা যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে দেখেই।

এই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশধারাকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করতে হলে আমাদের চিন্তা, আচরণ ও কর্মকে তাঁদের মানদণ্ডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে হবে। এই পথে স্পর্শিত প্রতিটি পরিবারে যেন সৌহার্দ্য বিরাজ করে। যেখানে যেখানে সাধকরা একত্রিত হন, প্রতিটি কেন্দ্রে যেন ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্মিক সমাজে কখনও কখনও যে ক্ষুদ্র বিভেদ প্রবেশ করে, বসন্তের এই উষ্ণ রৌদ্রে তা যেন বিলীন হয়ে যায়। আমরা যেন স্মরণ রাখি, আমরা সবাই একই বংশধারার সন্তান, একই প্রাণাহুতির গ্রহীতা, এবং একই গন্তব্যের দিকে অগ্রসরমান পথিক।

যদি লালাজী তাঁর শিষ্যকে বিকশিত হতে দেখার আনন্দে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার দান করতে পারেন, আর যদি বাবুজী এমন এক প্রেমে ভালোবাসতে পারেন যা রাধার প্রেমকেও অতিক্রম করেছে, তবে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পাশের ভাই-বোনদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারি, ক্ষুদ্র অভিমানগুলো ছেড়ে দিতে পারি, এবং আমাদের মধ্যে যে দান অর্পিত হয়েছে তার যোগ্য ধারক হয়ে উঠতে পারি।

অতএব, আমাদের গুরু মহারাজদের প্রেম আপনার হৃদয় স্পর্শ করুক, প্রাণাহুতি আপনার সত্তাকে রূপান্তরিত করুক, এবং আপনি আপনার নিজস্ব পথে তাঁদের উত্তরাধিকারের এক জীবন্ত সাক্ষ্যে পরিণত হন।

ভালোবাসা ও প্রার্থনাসহ,
কমলেশ

বসন্ত পঞ্চমী, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

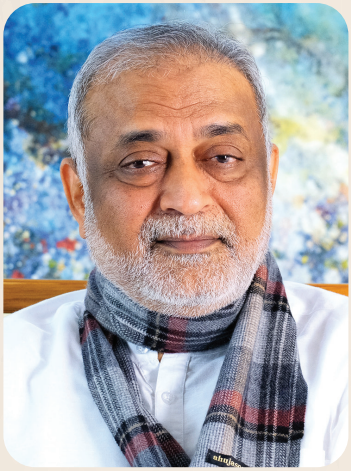

দাজীর সঙ্গে মাস্টারক্লাস

আপনি যেকোনো সময়ই হার্টফুলনেস মেডিটেশন শুরু করতে পারেন! দাজীর সঙ্গে তিন পর্বের একটি মাস্টারক্লাস সিরিজে যোগ দিন, যেখানে তিনি হার্টফুলনেস পথের উপকারিতা ভাগ করে নেবেন এবং কীভাবে হার্টফুলনেস শিথিলীকরণ, ধ্যান, সাফাই ও প্রার্থনাকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে যুক্ত করা যায় তা ব্যাখ্যা করবেন। সব মাস্টারক্লাস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

https://heartfulness.org/global/masterclass/

হার্টফুলনেস অনুশীলনসমূহ

হার্টফুলনেসের অনুশীলনগুলি আবিষ্কার করুন - শিখুন কীভাবে শিথিল হতে হয়, ধ্যান করতে হয়, সাফাই করতে হয় এবং প্রার্থনা করতে হয়।

https://heartfulness.org/in-en/heartfulness-practices/

heartfulness

purity weaves destiny